মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ রচিত

নারী

পশ্চিমা গবেষক ও আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে

অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল মামুন

Sunnah
Today

অনুবাদক পরিচিতি

জন্ম ১৯৯৩ সালের ২৭ আগস্ট। জন্মস্থান বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার উজলকুড় ইউনিয়নের চাঁদপুর শংকর নগর গ্রামে। বাবা-মার হাত ধরেই তার পড়ালেখার হাতেখড়ি। এরপর ক'বছর নিজ গ্রামের শামসুল উলম সিদ্দিকিয়া কওমি মাদ্রাসার নুরানি বিভাগে প্রাথমিক লেভেলের পড়াশোনা। তারপর উক্ত প্রতিষ্ঠানে ওয়ালিদে মুহতারামের অধীনে নাযিরা কমপ্লিট করে। তারপর ওয়ালিদে মুহতারামের কর্মস্থান পরিবর্তন হওয়ায় তার সাথে রামপাল থানার গৌরম্ভা ইউনিয়নের বর্নী-ছায়রাবাদ গ্রামে অবস্থিত বর্নী-ছায়রাবাদ হাফিযিয়া মাদ্রাসায় গমন ও পিতার তত্ত্বাবধানে হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করেন। হিফযুল কুরআন সমাপন করে খুলনা জেলার খান জাহান আলী থানার শিরোমণি হাফিজিয়া মাদ্রাসায় উস্তাযুল হুফফায হাফেজ ইব্রাহিম হাফি. হিফয তাসমি (শুনানি) সমাপন করেন। তারপর ভর্তি হন খুলনার বিখ্যাত ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম মাদ্রাসায়। তারপর গোপালগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ইসলামপুর ভবানীপুর মাদ্রাসা থেকে "জালালাইন", "মিশকাত" (অনার্স)-এ বোর্ড পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ১১তম স্থান অর্জনসহ কৃতিত্বের সাথে সমাপন করেন। তারপর ওয়ালিদে মুহতারামের মনোবাসনা পুরোনার্থে আবারও খুলনার বিখ্যাত ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে থেকে দাওরা হাদিস (মাস্টার্স) ও ফিকহে হানাফির ওপর উচ্চতর ইসলামি আইন গবেষণা বিভাগ (ইফতা) থেকে ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি "তানযিমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন" কর্তৃক পরিচালিত তানযিমুল উম্মাহ মাদ্রাসা, খুলনা শাখায় প্রধান আরবি শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নাযিমে তালিমাত-এর দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে আঞ্জাম দিচ্ছেন। পাশাপাশি বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, শের-এ-বাংলা রোড, খুলনা-এর ইমাম খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। জুমআবার খুতবাপূর্বক আলোচনায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যুগোপযোগী আলোচনার জন্য বহু দূর দুরান্ত থেকে তার আলোচনা শুনতে লোকেরা ছুটে আসেন।

এছাড়াও তিনি লেখালেখির সাথে যুক্ত আছেন অনেকদিন ধরে। মৌলিক ও আরবি থেকে অনুবাদের কাজ আনজাম দেওয়ার মাধ্যমে উম্মাহর খেদমত করে আসছেন। আমরা তার দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা কামনা করছি।

পাঠকের কাছে ‘‘লেখক পরিচিতি’’

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহি.। সুখ-জাগানিয়া ও পুণ্যপ্রবাহে হৃদয়-মঞ্জিমা-স্নিগ্ধকর সুবিদিত নাম। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক, সমাজ সংস্কারক ও আধ্যাত্মিক রাহবার। ইতিহাস, দর্শন, মনীষা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, গবেষণা-এষণা, সাহিত্যসাধনা, চিত্ত-শুচিতা, উম্মাহর দরদ ও মুসলিম উম্মাহর দিব্যপ্রাণ-দরদি ভাষ্যকার- ইত্যাদি তাঁর নান্দনিক ও সপ্রতিভ জীবন-অভিধানের অনুসঙ্গ।

বিদ্বান ও বিদগ্ধজনের কাছে তার পরিচয় নতুন নয়। অভিজ্ঞান, চেতনাপোলব্ধি, বোধ, দূরদর্শীতা, সাত্ত্বিকতার দ্যুতি দিয়ে তিনি উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরব, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দিক-দিগন্ত বর্ণোজ্জ্বল করেছেন। বহুমাত্রিক ও বহুরৈখিক প্রতিভা এবং প্রাণার্দ্রতার কারণে সর্ব শ্রেণির কাছে তিনি স্থায়ী আসন পেয়েছেন। বিরলপ্রজ এই মহান-মোহন ব্যক্তিত্ব ছিলেন শিক্ষা-আদর্শ, ঐতিহ্য-সভ্যতা ও মুসলিম জাগরণের পার্থসারথি। পূর্ববর্তী সাধক ও তাপস-সম্রাটদের সতত প্রতিচ্ছবি। আন্তর্জাতিক ইসলামি সাহিত্যান্দোলনের স্বকৃত স্থপতি ও পৃথিকৃৎ।

তারুণ্যেই ‘সব গুণের আধার’

বর্ণালি শৈশব ও রঙিন কৈশোর পেরিয়ে তিনি যখন অনুর্ধ্ব বিশের তরুণ। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহি. তখন তাকে “জামেউল কামালাত” বা সব গুণ-কীর্তির আধার বলে খেতাব দেন। একই সঙ্গে যুগশ্রেষ্ঠ চারজন আধ্যাত্মিক নির্দেশক ও দীক্ষাগুরু থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। নিজের জীবন-আঙিনা করে তুলেন আলো-জ্বলমলে ফর্সা।

বয়সসীমা ত্রিশ পেরোনোর আগেই আলোড়ন সৃষ্টি করেন আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে। রচনা করেন জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ **“মাজা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন”**। যে গ্রন্থটি পাঠ করে মুসলিম-অমুসলিম পণ্ডিত, বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ ও শীর্ষস্থানীয় আলোচকরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সে যে গ্রন্থটি নিয়ে রব ওঠে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘যুক্তরাজ্যে লেখকের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে স্বীকৃত না হলে এবং বৃটেনে কোনো বই প্রবেশ নিষিদ্ধ করার আইনগত সুবিধা থাকলে আমি একটি বই নিষিদ্ধ করতাম। আর বইটি হলো- ভারতীয় লেখক আবুল হাসান আলী নদভী রচিত- Islam and the world।

সপ্রতিভ পদচারণায় দীপ্তকর্ম :

লখনৌর নদওয়াতুল উলামা থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টার পর্যন্ত মনস্বী এ কলমসৈনিকের সপ্রতিভ পদচারণা। সাধারণ উদ্দেশ্যে লেখা তার ইতিহাসআশ্রিত গল্পগ্রন্থ "কাসাসুন নাবিয়্যিন" বিভিন্ন দেশের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্নেহের ভাতিজার জন্য লেখা এই বই লাভ করে 'দামেশক আরবি একাডেমি' পুরস্কার। তার কথামালা হয় সংকলিত। বক্তৃতা হয় গ্রন্থিত। রচিত পুস্তকাদি হয় মিষ্টি চেতনার সরস কাঠি। চিন্তার প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে প্রাণজ ও ভাবনাকুল দৃব্যদৃষ্টির সুখদ বারতা। বোধ, উপলব্ধি ও মূল্যায়ন হয় ইতিহাসের আকর নির্দেশনা। যে পুণ্যাত্মার জীবনযাত্রা শুরু হয় 'আভিজাত্যময়' দারিদ্র্যতার মাধ্যমে। জীবনের মধ্য গগণে প্রাচুর্য-বৈভবের স্রাতে এলেও সারা অঙ্গ-সৌষ্ঠবে সাজিয়ে রাখেন দারিদ্র্যের গৌরব।

আধুনিকবিশ্বের প্রচারবিমুখ বুদ্ধিবৃত্তিক মহানায়ক

নয় বছর বয়সে বাবা হারানো ছেলেটি বেড়ে ওঠে পুণ্যময়ী মায়ের দোয়ার শামিয়ানা ও বড় ভাই ড. সাইয়েদ আবদুল আলী রাহি.-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কে জানতো এ বালকই একদিন হয়ে উঠবেন আধুনিকবিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তা-গবেষণা, ইসলামি জাগরণ-বিপ্লব ও কর্মোচ্ছল সাধনার অন্যতম প্রাণপুরুষ।

পৃথিবীব্যাপী চষে বেড়ানো এ মনীষী যখন ভারতে নিজ কর্মস্থলে ফিরতেন, তখন শত শত তৃষিত হৃদয় তাকে ঘিরে ধরতো। তিনি সবাইকে নিষ্ঠাবিধৌত জ্ঞানবারিতে সিক্ত করতেন। বড় বড় রথী-মহারথী ও স্বনামধন্যরা সমবেত হতেন এই দিবাকরের আলোক-দীপ্তি পেতে। বিভিন্ন সময় ভারতের মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা আসতেন তার পরামর্শ নিতে। গভর্নর আসতেন কিছু আরজ করতে। নদওয়ার মাঠে হেলিকপ্টার নামিয়ে সোজা আল্লামা নদভীর কক্ষপানে হাঁটা ধরতেন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যসভার বড় বড় সদস্য। ইন্দিরা গান্ধী তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি অসম্মতি জানান। চলে যান রায়বেরেলির গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু সেখানেও প্রধানমন্ত্রী ছুটে যান সেখানে । রায়বেরেলির সড়কের নাম করণ করেন 'আল্লামা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী মার্গ'। প্রচারবিমুখ এমন দরবেশকে প্রয়াত রাজীব গান্ধী ও অটল বিহারী বাজপেয়ীও ঘিরে ধরেন।

এই পৃথিবী একবারই পায় তাকে...

১৯৯৮ সালে দুবাই সরকার তাকে শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনোয়ন করে। পদক, পুরস্কার ও সনদ গ্রহণ করতে দাওয়াত করে। কিন্তু তিনি সাফ জানিয়ে দেন, কোনো পদক-পুরস্কারের জন্য কোথাও যাননি; সুতরাং দুবাইও যাবেন না। অনেক কিছুর পর দুবাই সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলে। বিশেষ একটি বিমান দুবাই থেকে উত্তর প্রদেশের লখনৌ প্রেরণ করে। বিমানটি শায়খ নদভীকে নিয়ে যায় এবং অনুষ্ঠান শেষে পৌঁছে দিয়ে যায়। শাইখ নদভীর জন্য ভারত সরকার লখনৌর আভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক করে। জরুরি বহির্গমনের অফিসিয়াল কাজের জন্য দিল্লি থেকে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের লখনৌ পাঠায়। ভারতে এমন নজির এর আগে দেখা যায়নি। পরদিন বিশ্বমিডিয়ায় এ বিরল ঘটনাটি প্রচার হয়।

ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে পবিত্র কাবাঘরের চাবি হাতেগোনা কয়েকজন মানুষকে সম্মানসূচক দেওয়া হয়। তাদের একজন শহীদ বাদশাহ ফায়সা ও অন্যজন উপমহাদেশ বা গোটা অনারবের গৌরব শাইখ আলী মিয়া নদভী রাহি.। কাবা শরিফের চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বিরল সম্মান জানানো হয়েছিল তাকে। আপন হাতে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে মহান আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করেন।

আগ্নেগিরির উত্তাপ ছড়ানো রচনাকর্মে মহীয়ান

তার লিখিত ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা দু'শতাধিক। আরবি সাহিত্যে তার উচ্চ মার্গীয় পাণ্ডিত্যে বড় বড় আরব-সাহিত্যিকরা রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করতেন। এসব গ্রন্থ বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামি সংস্কৃতি, দাওয়াত, তালিম ও তাবলিগের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার বিজয়ী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ জ্ঞানতাপসের রচনাশৈলী, নান্দনিক বাক্যবিন্যাস, বর্ণনার সৌকর্য, দৃষ্টিভঙ্গির নিরম্বু গভীরতা ও বিষয়বস্তুর নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মুসলমানদের প্রাণে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করে। মুসলিমদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে আনতে তার কলম ছিল সদা সোচ্চার।

আগামী দিনের বিশ্বব্যবস্থারূপে ইসলামি চিন্তা-চেতনার অন্তর্নিহিত প্রতিপত্তি তার বই "ইলাল ইসলাম মিন জাদিদ"। ইসলামের দেড় হাজার বছরের ধর্মীয় সংস্কার ও জাগৃতি আন্দোলনের নির্বাচিত মনীষীদের জীবনচরিত পাঁচ খণ্ড-বিশিষ্ট "রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ" গ্রন্থে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেন। নিজের জীবনবৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞান লিখে গেছেন "ফি মাসিরাতিল হায়াত"-এ। জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বগুলো নিজে লিখতে বিব্রতবোধ করতেন, তাই সেসব নিজে লিখেননি। পরবর্তীতে অন্যরা বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

শৃঙ্খলিত জীবনে মহান লক্ষ্য পানে...

আমল-আজকার, গভীর চিন্তামগ্ন এই সাধকপুরুষ কঠোর শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করতেন। শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় দিকপালের পত্র-চিঠিও পড়েছেন অনেক ঘণ্টা পরে। জীবনের মাপা সময় কখনো অপচয় হতে দেননি তিনি। চোখে অসুবিধা ছিল তাই খুব বেশি লিখতে পারতেন না। শ্রুতিলিপি করার জন্য ছিলেন বিশেষজ্ঞ সহযোগী। পত্রের জবাব লেখার জন্য, প্রকাশনা সহকারী, তথ্য ও উৎসগ্রন্থ অনুসন্ধান, তাফসির-হাদিস ও ফিকাহবিষয়ক গবেষণা সহযোগী, আন্তর্জাতিক ও মিডিয়া অ্যাডভাইজার, ইংরেজি ও উর্দু ভাষ্যকার, মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সহযোগী এবং ইউনিভার্সাল লিগ অব ইসলামিক লিটারেচার ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান সহযোগী নিয়ে ছিল তার হাতে তৈরি চিন্তাকর্মের বাহিনি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার সুশৃঙ্খল বলয়।

পদধূলিতে ধন্য করেছেন এই ভূমি

শায়খ নদভী বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি ব্যক্তিত্ব শাইখ আল্লামা সুলতান যওক নদভী রাহি.-এর আহ্বানে দুইবার বাংলাদেশ সফর করেন (১৯৮৪ ও ১৯৯৪ সালে)। বাংলাদেশের আলিমদের সঙ্গে তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি চাইতেন বাংলা ভাষায় তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো অনূদিত হোক। এ বিষয়ে তিনি খোঁজ খবরও রাখতেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যে আলেমদের ব্যাপকহারে এগিয়ে আসার তপ্ত আহ্বান জানান তিনি। হৃদয় বিগলিত দরদ নিয়ে বলেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে বাংলা ভাষার বাগডোর অন্যদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। আপনারা চিরকাল পাঠক হবেন, আর অন্যরা লেখক হবে- এটা কাম্য নয়; শোভনীয় নয়। বাংলা ভাষাচর্চায় শিথিলতা আলেমদের বাংলাদেশে অপাঙক্তেয় করে দেবে। সতর্ক থাকুন সবসময়।" সারা দুনিয়ায় তার ২৩জন খলিফার মধ্যে বাংলাদেশের আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ সালমান ও মাওলানা আবু সাঈদ ওমর আলী রাহি. রয়েছেন। তাদের প্রচেষ্টায় শাইখ নদভীর চিন্তাধারার সঙ্গে এ দেশের আলেমসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ঘটে।

কর্মমুখর জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট

১৯৩৪ সালে তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাফসির, হাদিস, আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষা দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধও হন। ১৯৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন জয়গায় ইলমি সফর করেন। এই সফরে তিনি মাওলানা শাইখ আবদুল কাদির রায়পুরী রাহ. ও তাবলিগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস কান্ধলভী রাহি-এর সঙ্গে স্নেহভাজন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে তাদের নিজের কর্মজীবনের পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করেন। শাইখ রায়পুরী কাছ থেকে তিনি আত্মশুদ্ধি বিষয়ক পরামর্শ নিতেন। দ্বিতীয়জনের কাছ থেকে ধর্মপ্রচার, উম্মাহ-চেতনা ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক পরামর্শ পেতেন। আরবদেশগুলোতে তাবলিগ জামাতকে পথ-পরিচয় করে দেওয়ার মূল নায়কও তিনি। সারাজীবন তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

১৯৪৩ সালে দ্বীনি শিক্ষার জন্য "আঞ্জুমানে তালিমাতে দ্বীন" নামক একটি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি নদওয়াতুল উলামার প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে নদওয়াতুল উলামার তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের পরিচালক সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রাহি-এর অনুরোধে শিক্ষাবিভাগের উপ-পরিচালকের দায়িত্ব নেন। ১৯৫৪ সালে সুলাইমান নদভীর ইন্তেকালের পর তিনি শিক্ষাবিভাগের পরিচালক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে বড় ভাই ড. আবদুল আলী আল-হাসানীর মৃত্যুর পর তিনি নদওয়াতুল উলামার মহাসচিব নির্বাচিত হন।

১৯৫৫ সালে ঐতিহ্যবাহী ও বিশ্বখ্যাত আরবি পত্রিকা "আল-বাস আল-ইসলামী" ও ১৯৫৯ সালে পাক্ষিক "আর-রাইদ"-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে দামেশকের "আরবি ভাষা ইনস্টিটিউট"-র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে লখনৌতে "ইসলামিক গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালে মক্কায় সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম উপস্থিত থাকতে না পারায় তিনি "রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামি"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের শাসক সাউদ বিন আবদুল আজিজ, লিবিয়ার শাসক ইদরিস সেনুসিসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই তিনি "সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ সালে সৌদি শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ বিভাগের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৮০ সালে জর্দান আরবি একাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন। ওই বছর ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে "আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা"র প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক নির্বাচিত হন।

গৌরবদীপ্ত বন্দনায় নন্দিত জীবন

জীবদ্দশায় তার জীবনকর্মের উপর ২৫টি পি.এইচ.ডি থিসিস হয়। তার দুই শতাধিক গ্রন্থের প্রায়গুলো প্রাচ্য ও প্রশ্চাত্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় অনুদিত হয়েছে। মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। জীবদ্দশাতেই তার নামে মদিনায় সড়কের নামকরণ করা হয়।

প্রজন্মের বিরল শিক্ষাবিদ হিসেবে পৃথিবীব্যাপী তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তারচেয়ে বড় কোনো পণ্ডিতের চর্চা তার জীবদ্দশায় দেখা যায়নি। তিনি ইসলামিক সেন্টার জেনেভা, ইউএসএ আরবি একাডেমি, লন্ডনের ইসলামিক সেন্টারসহ ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন। ভারত সরকারের সম্মানসূচক সবকটি পদক পেয়েছেন। ভারতবর্ষে ইসলাম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের আজীবন সভাপতি ছিলেন। দাওয়াত ও তাবলিগের অন্যতম মুরুব্বি ছিলেন। নিউজিল্যান্ড থেকে চিলি- পৃথিবীর সব আলিমদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসায় ঋদ্ধ তার জীবন।

জীবন ছেড়ে মহাজীবনের পথে

প্রখ্যাত এই ক্ষণজন্মা মনীষী, প্রখ্যাত দাঈ, প্রচারবিমুখ বুজুর্গ-সাধক, শুভার্থী ও ইসলামি চিন্তানায়ক, ইতিহাসের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও উম্মাহর দরদি অভিবাবক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহি. ১৯৯৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর (২৩ রমজান, রোজ শুক্রবার, ১১.৫০ মিনিটে) কুরআন মাজিদের সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াতরত অবস্থায় মহান রবের সান্যিধ্যে গমন করেন।

ভারতীয় জনতার বিপুল সমাগম ও শোকাভিভূত পরিবেশ সৃষ্টির ভয়ে আত্মীয়রা তাকে ইন্তেকালের দিন রাত দশটার মধ্যেই দাফন করে নেন। রাতটি পার হলে ভিড় সামলানো কারো পক্ষে সম্ভব হতো না। পরদিন লাখো জনতা এসে কেবল বকর জিয়ারত করেন। জানাযা ও দাফনকাজে শরিক হতে কাতারের বাদশাহ ও ইসলামি চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারাদাভি বিশেষ বিমান যোগে রাতেই দোহা থেকে লখনৌ এসে পৌঁছান। কিন্তু নদওয়ার ফ্যাক্স সংযোগ দুর্বল থাকায় তাদের বার্তা কর্তৃপক্ষ পায়নি। ফলে তারা জানাজা ও দাফনে শরিক হতে পারেননি। উত্তর ভারতের কঠিন শীত ও কুয়াশার কারণে তারা রাতে ফিরতেও পারেননি। পরদিন বিষাদক্লিষ্ট মনোরথের বাদশাহকে নিয়ে বিশেষ বিমানটি ভারত ত্যাগ করে।

তার ইন্তিকালের খবর মক্কা-মদিনায় পৌঁছালে, সেখানকার শাসকবর্গ ২৭ রমজান তারাবির পর পবিত্র দুই হারামে আল্লামা নদভীর গায়েবি জানাযা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এতে বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ মুসলিম শরিক হন।

তার মতো কীর্তিমান ব্যক্তির মৃত্যু নেই। পুণ্যযাত্রার ক্ষয় ও শেষ নেই। পৃথিবীতে তিনি কীর্তি ও অবদানে ভাস্বর। তার সৃজিত রচনা ও দরদমাখা সাহিত্যপ্রসূন ও সৃষ্টিমুখর কর্মের কারণে তিনি যুগ পরম্পরায় চির অমর হয়ে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা তার কবরে রহমতের ফল্গুধারা অব্যাহত রাখুন।

[সংকলিত ও সম্পাদিত]

নারী

পশ্চিমা গবেষক ও আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে

"নারী" বর্তমান বিশ্বের এক আলোচিত বিষয়। নারীর অবস্থা-অধিকার নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। সর্বশেষ বিভিন্ন ধর্মে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে শেকড়সন্ধানী পড়াশোনা করছেন গবেষকরা। সেই অধ্যবসায় ও গবেষণার আলোকে তারা খুঁজে পেয়েছেন, কুরআন মাজিদ ও ধর্মশ্রেষ্ঠ ইসলামই নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। একথা স্বীকার করেছেন সমকালীন প্রাচ্যের কয়েকজন ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি গবেষক। তারা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করেছেন, ইসলাম নারীকে তার যথার্থ অধিকার দিয়েছে। নারীকে সম্মানিত করেছে। অপূর্ব শ্রদ্ধার আসনে করেছে সমাসীন।

আমরা এখানে গবেষকদের দেওয়া কয়েকটি খণ্ড জবানবন্দী পত্রস্থ করছি। প্রথমেই এমন একজন পশ্চিমা গবেষকের সাক্ষ্য তুলে ধরছি, যিনি নিজেই নারী, যিনি দীর্ঘ দিন সংস্কারমূলক প্রশিক্ষণ কর্মে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের ভারতে। তিনি "থায়ামোফিক্যাল সোসাইটি" নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানা ছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন নারী। আর যে কোন নারী "নারী বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হবেন এবং কোন অবিচারের প্রতিবাদী হবেন এটাই স্বাভাবিক।" তিনি হলেন মিসেস এ্যানি বেসান্ট (Mrs. Annie Besant)।

এ্যানি বেসান্টের বক্তব্য

এ্যানি বেসান্ট বলেন, আপনি এমন অনেক লোক পাবেন, যারা ইসলামের সমালোচনা করে শুধু এ কারণে যে, ইসলাম একাধিক বিবাহকে বৈধ করেছে; অবশ্য সীমিত সংখ্যায়, কিন্তু লন্ডনের একটি সেমিনারে আমি করেছিলাম একটি ভিন্ন অভিযোগ। আমি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে বলেছিলাম, একটিমাত্র বিবাহের ধোয়া তুলে অসংখ্য নারীর সাথে মেলামেশা শুধুই কপটতা ও ভণ্ডামি। সীমিত একাধিক বিবাহের বৈধতার চাইতেও বেশি অপমানজনক এটা। আজ মানুষ এই জাতীয় কথাকে অপছন্দ করে, অথচ এগুলো বলা দরকার। কারণ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, নারী সম্পর্কে ইসলামি রীতিনীতি আমাদের এই ইংল্যান্ডেও কিছুকাল আগ পর্যন্ত মানা হতো। ইংল্যান্ডের নারী সভ্যতায় ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন খুব প্রাচীন অতীত নয় এবং এই আইনই ছিল সর্বাধিক ন্যায়সংগত ইনসাফভিত্তিক। সমকালীন পৃথিবীর সর্বাধিক সুন্দর ও নীতিসমৃদ্ধ আইন ছিল এটা। এই আইনে, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব ও তালাকের ব্যাপারে পশ্চিমাদের চাইতেও অধিক উন্নত ছিল এই আইন। নারীর অধিকারের যথার্থ সংরক্ষক ছিল এই আইন। কিন্তু এই বিবাহ আর একাধিক বিবাহের স্লোগান মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ঘুলিয়ে ফেলেছে, অথচ তারা দৃষ্টি মেলে দেখে না, এই প্রাচ্যে একজন নারীকে বার্ধক্যে যখন 'মন ভরে না' অভিযোগ এনে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়, তখন আর তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। তারা ভাবে না এই অপমান থেকে নিষ্কৃতির উপায় সম্পর্কে।

এন. এল. কলসেনের বক্তব্য

মিস্টার এন. এল. কলসেন (N. L. Coulsen) লেখেন, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা অনন্য, বিশেষ করে বিবাহিতা নারী সম্পর্কে কুরআনি আইনের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে ইসলামের প্রচুর আইন রয়েছে। এর উদ্দেশ্য নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা। আরবদের রীতিনীতিতে ইসলামের এই আইন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে নিয়ে স্বতন্ত্র আইন রচনা করেছে, যা ইতিপূর্বে আর হয়নি। ইজ্জতের সীমারেখা নির্ধারণপূর্বক তালাকের আইনে কুরআন মাজিদ এক ব্যতিক্রমী পরিবর্তন সাধন করেছে।

ধর্ম ও সভ্যতা বিষয়ক বিশ্বকোষের এক প্রাবন্ধিক লিখেছেন, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আরব্য সমাজের অবহেলিত নারী জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ করে যে নারী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত জানোয়ার হিসেবে গণ্য হতো, সেই নারী মৃত স্বামীর সম্পদের অংশীদারের মর্যাদা পেয়েছে। অধিকন্তু ইসলাম তাকে দিয়েছে স্বাধীন জীবন। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতেও এখন বাধ্য নয়। স্বামী তালাক দিলে স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়ার বিধান প্রবর্তন করেছে ইসলাম। তাছাড়া বিবাহের সময় উপহার হিসেবে যা পেয়েছিল, তাও ফেরত দিতে হয়।

উঁচু শ্রেণীর নারীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্যের প্রতিও ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। তাদের কেউ কেউ গদ্যে ও পদ্যে উচ্চতর স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেকে তো শিক্ষিকা হিসেবেও সাহিত্যকর্ম করেছেন। সাধারণ শ্রেণীর নারীরা নিজেদের ঘর-সংসারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, রাণীর মত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেছেন। তারা সুখ-দুঃখে স্বামীর অংশীদার হয়েছেন। মায়েরা অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছেন।

নতুন সভ্যতার সূচনা

কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষার আলোকে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষকদের এই চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নারী জাতির জন্যে একটি নতুন দিগন্ত বলা যায়। বলা যায় একটি নতুন নির্দেশনা ও নতুন পথ । কারণ ইসলাম-পূর্ব যুগে নারী ছিল চরমভাবে অবহেলিত। গৃহপালিত পশু, বাজারের পণ্যসামগ্রী আর নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। বন্ধক হিসেবে রাখা হতো। তারা ব্যবহৃত হতো রংমহলের শোভা-সৌন্দর্য হিসেবে।

অধঃপতনের এই ভয়ানক দুর্দিনের আবির্ভূত হলো এই নতুন সভ্যতা—শুরু হলো মহাইনকিলাব–মহাবিপ্লব। এ বিপ্লব ছিল চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব।

বরকতময় এই বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছিল সর্বত্রই। সেটাই ইসলাম। এই বিপ্লবের স্বাদ ভোগ করেছে কম-বেশী সকল রাষ্ট্রই। সকল দেশ ও সমাজই এই বিপ্লবকে সামর্থ্য মাফিক স্বাগতম জানিয়েছে, বিশেষ করে যে সব দেশে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছে, সেসব দেশ অথবা যেখানে ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে কিংবা আমলি দাওয়াত ও আমলি নমুনা হিসেবে যেখানে প্রবেশ করেছে, সেখানেই এই বিপ্লব অভ্যর্থনা পেয়েছে, অভিনন্দিত হয়েছে।

ইসলামের এই মানবিক উপহার সে সব দেশে সর্বশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, যেখানে বিধবা নারীরা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত। আর অবলীলায় সমাজও তাদেরকে স্বামীর পরে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উপযুক্ত মনে করত না। তারা নিজেরা ভাবত পতির মৃত্যুর পরে আর বেঁচে থাকার অধিকার কোথায়? এই অন্ধকারে আলোর প্রদীপ জ্বেলেছে ইসলাম। বঞ্চিতাদের এই আঁধার ভাগাড়ে ইসলাম এনেছে নয়া বিপ্লব। মুসলিম শাসকগণ তাদের শাসনামলে এসব হিন্দুআনী অপসংস্কৃতির সংস্কার করেছেন যত্নের সাথে। তাদের সংশোধনের পথ করে দিয়েছেন। বিশেষ করে "সতীদাহ" প্রথাকে এমনভাবে সংশোধন করেছেন যাতে ভারতীয় সভ্যতাও পথে মারা যায়নি এবং অপমানিতও হয়নি; অথচ আসল সত্য জেগে উঠেছে স্বমহিমায়।

এ সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রখ্যাত পর্যটক ডক্টর বারনিয়ার লিখেছেন

"আজকাল ভারতবর্ষে সতীদাহের হার কমেছে। কারণ এ দেশের মুসলিম শাসকরা এই পাশবিক প্রথাটি নির্মূল করতে যারপরনাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকারী কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। কেননা এ দেশের শাসকদের নীতি হলো, তারা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ধর্মীয় প্রথাবিরোধী কোন কিছু করা প্রশাসনিক নীতির পরিপন্থী। বরং সকল ধর্মের সমান স্বাধীনতা স্বীকৃত এখানে। এরপরও বিভিন্ন কায়দা-কৌশলে তারা সতীদাহের সংস্কৃতিকে নির্মূল করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যেমন– কোন মহিলা প্রাদেশিক বিচারকের অনুমতি ছাড়া সতীদাহ করতে পারবে না বলে আইন করা আছে। আর প্রাদেশিক বিচারক তাকে ঘোরাতে থাকেন। যদি পূর্ণাঙ্গ আস্থা হয়ে যায়, এই নারী স্ব-ইচ্ছাই অটল, সে এই সিদ্ধান্ত থেকে আদৌ ফিরে আসবে না, তখনই কেবল কোন নারীকে সতীদাহের অনুমতি দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বিচারক বিধবাকে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন। তর্ক-বিতর্ক হয়। তাদেরকে বিভিন্ন আশা দেওয়া হয়। ভয় দেখানো হয়। তখন কোন কৌশলই যদি কাজে না লাগে, তখন অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । মহলের বেগমরা তখন তাকে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন। এত সব কায়দা-কৌশলের পরও সতীদাহের সংখ্যা এখনও বেশ, বিশেষ করে যে সব রাজার এলাকায় মুসলিম বিচারক নেই, সেখানে সতীদাহের সংখ্যা বেশি ।" এটা বাদশাহ শাহজাহানের আমলের কথা।

ইসলামি চিন্তাবিদ কবি ইকবাল রাহ.-এর দৃষ্টিতে নারী

বর্তমান সময়ের দার্শনিক কবি ডক্টর ইকবাল এমন সময় শিক্ষা লাভ করেছেন যখন নারী স্বাধীনতা সংগ্রাম তার স্লোগানে সারা পৃথিবীকে এমনভাবে মাতাল করে রেখেছিল যে, এর বিপরীত কোন শব্দ উচ্চারণ করার কারও হিম্মত হতো না। নারী আন্দোলনের শিংগার ধ্বনিতের হারিয়ে যেত যে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ। ইকবাল লেখাপড়া করেছেন ইউরোপে। তার অবশিষ্ট জীবন কেটেছে নারী স্বাধীনতা আর সমানাধিকা সংগ্রামের পবিত্র ভূমিতে। নারী বিপ্লবের তপ্ত বাতাস ইকবালের জীবনকে অতিষ্ঠ করে ফেলবার উপক্রম করেছিল বটে; কিন্তু ইকবাল হোঁচট খাননি। তার চিন্তা ব্যাহত হয়নি। পরাজয় বরণ করেনি তার আদি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিশ্বাস আধুনিক কালের ভঙ্গুর স্লোগানের কাছে। অপরিপক্ক ও অযৌক্তিক বোঝাপড়া করতে সম্মত হয়নি তার হৃদয়।

ইসলামি চিন্তাবিদ কবি ইকবাল রাহি. নারী বিপ্লবে প্রকম্পিত ইউরোপে বসে বরং অবলোকন করেছেন ভিন্ন দৃশ্য, যে দৃশ্য স্থান পায়নি অন্য অনেকের দৃষ্টিতে। ইকবাল দেখেছেন, প্রাচ্যের দেশগুলোতে সর্বত্র কেবল বিশৃংখলা। কোথাও বাঁধন নেই। নিয়ন্ত্রণ নেই। মানবতার মৃতদেহগুলো সেখানে লা-ওয়ারিস হয়ে পড়ে আছে। এই বিশ্বাসভেজা দৃশ্য ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইকবালের চেতনাকে করেছে আর শাণিত। তার ইমানকে করেছে সুদৃঢ়–মজবুত। ইকবাল খুঁজে পেলেন, পশ্চিমা নারী আর মুসিলম নারী এক নয়। একজন মুসলিম নারী কখনো কোন পশ্চিমা নারীর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করতে পারে না, বরং এড়িয়ে চলা তার জন্যে অনিবার্য। ইকবালের দৃষ্টিতে কোন নারীর জীবনে শৃংখলা ও প্রতিষ্ঠা আসতে পারে না, যদি তার মধ্যে নারীত্ব, সাধুতা, পবিত্রতা, সততা ও মায়ের মমতা না থাকে এবং যে সম্প্রদায় এ কথাটি জানে না, বিশ্বাস করে না, সে সম্প্রদায়ের জীবনে কখনো প্রতিষ্ঠা আসবে না। তারা আজীবন বিশৃংখলা-ক্ষত, পরাজিত এক দুর্বল সম্প্রদায় হিসেবে বেঁচে থাকবে।

ইসলামী চিন্তাবিদ কবি ইকবালের ভাষায়

جهاں را محکمی از امهات است
نهادستان امین ممکنات است
اگایں نکته را قولی نداند
نظام کاروبارش بی ثبات است

কবি ইকবাল মনে করেন, তার জীবনের সকল উন্নতি, সচেতনা, চেতনা, বিশ্বাস-চিন্তা-বেদনা সবই তার মায়ের তরবিয়তের ফসল। তার মায়ের আত্মিক পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার অবদান। তিনি বলেন, আমার মধ্যে ইমান ও ভালোবাসার যে জ্যোতির্ময় দীপ্তি নজরে পড়ে এটাই আমার তাপসী মায়ের দৃষ্টিতে বরকত।

আমি যা কিছু পেয়েছি তার কোলেই পেয়েছি, তার তরবিয়তের মধ্যেই পেয়েছি। পাঠশালা আমাকে অন্তদৃষ্টিও দেয়নি, দেয়নি কোন ব্যথিত হৃদয়, বেদনাশীল অন্তর। এই সম্পদ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে আছে কিছু গল্প-কাহিনী। ইমান ও ব্যথা অনুভব করার মত অন্তর তো কেবল সেই পেতে পারে, যার তরবিয়ত ও লালন-পালন হয়েছে কোন ইমানদার মায়ের কোলে।

তার ভাষায় আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা

مراد او ایں خرد بودر جنبونی
مگاہ ماد رباك اندرونی
ز مکتب جشم و دل نتوان گرفتن
که مکتب نیست جز سحرو فسوي

ইকবাল মুসলিম নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, পশ্চিমা সভ্যতা যুবক পটানোর যে কৌশল ও সংস্কৃতি এবং ভিন পুরুষকে কুপোকাত করার কলা-শিল্প নারীদেরকে শিখিয়েছে, তা কোন মুসলিম নারীর ভূষণ হতে পারে না। তিনি নারীদের উদ্দেশে আরও বলেছেন, যে সব ফ্যাশন আর রূপচর্চা মুসলিম দেশগুলোতে এখন নন্দিত আর্ট হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে, এ সবেরও তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। গাঁজা আর পাউডারের সৌন্দর্যের প্রতি যেন তোমাদের আত্মার আকর্ষণ না হয়। কারণ তোমাদের মর্যাদা, তোমাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব ওই মেকী রূপ লাবণ্যে নেই। সে তো তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির মধ্যে নিহিত। যে নারীর মন পবিত্র, সে তো প্রকৃত সুন্দরী ।

দার্শনিক কবি ইকবাল আরও বলেন, সৌন্দর্য আর রূপের জন্যে তো উলঙ্গপনা শর্ত নয়! এই নব্যযুগ ও সভ্যতার কাছে কিছুই নেই। তাই সে উলঙ্গপনাকেই সম্মান ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর নূর ও আলোকে দেখ। কত শত সহস্র পর্দার ভেতরে তার অবস্থান, অথচ সেই আলোয় উজালা সারা জাহান। মুসলিম নারীদেরকেও এমন গুণে গুণান্বিত হতে হবে; তাদের আত্মাকেও আলোকিত করে তুলতে হবে এমন সব আমালাত ও পূর্ণতায় যাতে পর্দায় থেকেও তারা মানবতাকে উজ্জীবিত করতে পারে, ভাস্বর করতে পারে।

কবি ইকবাল বিশ্বাস করেন, যদি মুসলিম নারীদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী গুণাবলী থাকে, তাহলে তারাই হবে মানবতার লালনকারী অভিভাবক বন্ধু। মানবতা সর্বদায় তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী। সভ্যতা আসে, বিকশিত হয়, বিস্তৃতি ঘটে, আবার হারিয়েও যায়। কিন্তু মুসলিম নারী মানবতার এমন এক বৃক্ষ, যা কখনো বিরান হয় না, যা সদা ফলবান।

কবি মুসলিম নারীদের আরও বলেছেন, তোমার স্থান কিন্তু হৈ-হাঙ্গামা-তাড়িত মাঠ-প্রান্তর নয়। কল-কারখানা তোমার নিবাস নয়। তুমি যদি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে জীবিকার সন্ধান লেগে যাও, তাহলে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয়, যা মানবতার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে।

হে নারী, তোমার সৌভাগ্য তো এখানে, তুমি নবীনন্দিনী ফাতেমার পথে চলবে। স্বামীর ঘর আবাদ করবে। স্বামীকেই বানাবে চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্যবিন্দু। স্বামীর ঘরে বসে এমন সন্তান গড়ে তুলবে, যারা মুসলিমদের দুর্দিনের কাণ্ডারী হবে। ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেবে অকুণ্ঠ চিত্তে। এখন ইসলামের বড় প্রয়োজন। ইসলামের জন্যে হাসান-হুসাইন রাদি. দরকার। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কেবল মুসলিম জননীরা।

ডক্টর ইকবাল মনে করেন, মুসলিম জাতির দিন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা অনেক বড় অবদান রাখতে পারে। নারীর মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন শক্তি, বিশ্বাস ও দরদ দিয়েছেন যে, সে চাইলে এখনও মুসলিম জাতির ধমনীতে ইমানের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। ইকবাল তো ইসলামি ইতিহাসের সেই কাহিনী ভুলতে পারেন না এবং কোন মুসলিম নারীরও ভোলা উচিত নয়। কাহিনীটি হলো-এক উজ্জ্বলমতি আরব্য নারীর। প্রাণ খুলে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করছিল। তার সে হৃদয়স্পর্শী তিলাওয়াত এক কঠিন কাফের মানুষের আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তার বিশ্বাসের রুদ্ধ ইমানি আলো মুসলিম উম্মাহকে দান করেছিল। উমরের রাদি. মত দৃঢ়চেতা, প্রত্যয়ী বীরযোদ্ধা আমীরুল মুমিনীন; বিজেতা রাহবার যার মাধ্যমে উন্নতি ও বিজয়ের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। প্রাণে প্রশান্তি জেগেছিল রাসুল ﷺ-এর।

এই কাহিনী তো সকলেই পড়ে। উমর রাদি. তলোয়ার হাতে ইসলামের মূলোৎপাটনের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হন। সংবাদ পান বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কথা। ভাবেন তাদেরকেই আগে শায়েস্তা করা দরকার। হাজির হন বোনের ঘরে। কিন্তু বোনের ইমান-স্নাত কুরআন মাজিদের তিলাওয়াত উমর রাদি.-এর মনকে মোমের মত গলিয়ে দেয়। ইসলাম তার হৃদয়ে আসন পাতে মহাসমাদরে। কবি ইকবাল-এর কামনা— বর্তমান বিশ্ব আজ এমন নারীই কামনা করে। এই নারীর আজ বড় প্রয়োজন।

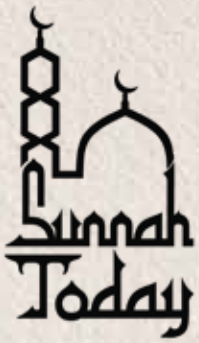

www.sunnahtoday.com www.maamoun.info